গ্রীনল্যাণ্ড ক্লাব

শ্রীস্বপন কুমার

সি. আই. ডি. সিরিজ—৭নং

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব

শ্রীস্বপনকুমার

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

পঞ্চম মুদ্রণ]

মূল্য : তিন টাকা

প্রকাশক ঃ
"রাজেন্দ্র লাইব্রেরী"
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড,
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত
"মা তারা প্রিন্টিং প্রেস"
৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

এজেন্ট ঃ
জেনারেল লাইব্রেরী এণ্ড প্রেস
১৩৩, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড [ক্যানিং স্ট্রীট], কলিকাতা-৭০০ ০০১

বাংলা-সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক,
রহস্য ও রোমাঞ্চ-সাহিত্যের যাদুকর
শ্রীস্বপনকুমার রচিত
সি. আই. ডি. সিরিজ

১। ছত্রপতির তলোয়ার
২। অপরাধী সম্রাট
৩। দস্যুরাজের ষড়যন্ত্র
৪। প্রাণ নিয়ে খেলা
৫। মিস্ট্রি গার্ল
৬। আঁধার রাতের যাত্রী
৭। গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব
৮। হীরার লকেটের রহস্য
৯। অজানা পার্শ্বেলের রহস্য
১০। নীল সাগরের আতংক

[এর পরে আরও বের হচ্ছে]

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

॥ এক ॥

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব।

দুটি শব্দ দিয়ে তৈরী নামটা।

লাল আর সবুজ দু'রঙের আলোয় এই নাম-দুটি জ্বলছে আর নিভছে।

বহু দূর থেকেও এ দৃশ্য দেখা যায়। তাই ক্লাবটিকে খুঁজে বের করতে খুব বেশী অসুবিধা কারও হয় না, আর হওয়া উচিতও নয়।

শোনা যায়, এই ক্লাবের মধ্যে যে একবার ঢুকেছে সে নাকি আর কোনদিন অন্য কোনও ক্লাবে যায়নি।

সন্ধ্যে হলেই নাকি মায়াবিনীর মত এই ক্লাব তাদের হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেছে।

ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ সকলের মুখেই এই ক্লাবের প্রশংসা শোনা যায়। এমন উঁচু ধরনের ক্লাব নাকি এ তল্লাটে নেই।

এই গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের প্রশংসা শুনে পুলিশের সন্দেহ হওয়াতে তারা কয়েকবার এ বাড়িতে হানা দিয়েছে, কিন্তু কোনরূপ সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করতে পারেনি।

এমনি কি এটাকে তারা সাধারণ একটি রেষ্টুরেণ্ট বলেই ভেবেছে। সামান্য ওয়াইনও কোথাও দেখেনি।

হোটেলের মালিক মিঃ ভাটিয়া বেশ শক্তিশালী পুরুষ। তার চোখ দুটি যেন সব সময় জ্বলছে। মনে হয় যেন কোন হিংস্র জন্তু শিকার ধরবার সন্ধানে আছে।

হাসলে যখন পান-খাওয়া দু'পাটি কালো ছোপ দেওয়া দাঁত বেরিয়ে পড়ে তখন তাকে আরও কদাকার দেখায়।

এই গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবটার সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত।

কিন্তু স্থানীয় থানার অফিসার মিঃ শেঠের ধারণা এই যে ওটা একটা বদমাইশের আড্ডা।

যদিও তিনি এর স্বপক্ষে কোনরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করতে আজও পারেননি, তথাপি তিনি আশা ছাড়েননি। তাঁর স্থির বিশ্বাস একদিন-না-একদিন তিনি নিশ্চয়ই গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের এই রহস্যের কিনারা করতে পারবেন।

* * *

সন্ধ্যে সাতটা থেকে শুরু হ'ল জনসমাগম। দেখা গেল সারি সারি রেষ্টুরেণ্টের মত চেয়ার টেবিল রয়েছে। সকলেই চপ, কাটলেট বা কফি অরেঞ্জ, কোকা খাচ্ছে।

খাবার পরিবেশন করছে উর্দিপরা বেয়ারা ও বয়েরা। আর একটি মোটা মতন ভদ্রলোক বসে খস-খস করে কাগজে বিল লিখছে।

সুন্দর ভদ্র পরিবেশ।

পাশে রেডিওতে হিন্দী গান শোনা যাচ্ছে।

এই রুমের উপরতলায় ম্যানেজারের ঘর। তিনিও একটি চেয়ারে বসে কাগজ-কলম দিয়ে লিখতে ব্যস্ত। এমন সময় বেজে উঠল ফোন।

—হ্যালো···ভাটিয়া স্পীকিং।

ফোনের অপরপ্রান্ত হতে শোনা গেল—আমি কানাই বলছি।

—বল, কি খবর ?

—ঐ মালটা আজ আসেনি।

—সেকি! আমি যে কাল ওদের মাল দেব বলে আশ্বাস দিয়েছি। আর মাল আসেনি ?

—না স্যার।

—তুই সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছেছিলি, না রাস্তায় কোথাও আড্ডা দিচ্ছিলি?

—কি যে বলেন স্যার! আপনার কাজে অবহেলা করার সাহস আজ পর্যন্ত কারও হয়েছে?

—তাও তো বটে।

—তাহলে এখন কি করবো স্যার?

—তুই ওখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখ, যদি কোন মালের গাড়ি না আসে, তবে সোজা ওখান থেকে হ্বর কাছে যাবি। তার বাড়িতে একটা কাগজের পুঁটলি আছে, সেটা শেঠ বিজয়রামের বাড়িতে পৌঁছে দিবি। বুঝলি?

—আচ্ছা স্যার।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করে বেড়ালেন মিঃ ভাটিয়া।

তারপর হঠাৎ একটা সুইচ টিপে ধরতেই দেওয়ালের একটা অংশ সরে গেল। সেখান থেকে নীচের দিকে নেমে গেছে সিঁড়ি ধাপে ধাপে।

সিঁড়ি বেয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকলেন মিঃ ভাটিয়া।

সেখানে অন্ধ-আতুর কানা-খোঁড়ার আড্ডা। সকলের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল। মিঃ ভাটিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকতেই সকলেই চুপ করে গেল।

এদের একটু দূরে একটি বিকটদর্শন লোক একটা ছেলেকে ভিক্ষা করার কসরৎ শেখাচ্ছিল।

মিঃ ভাটিয়ার ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল লোকটি।

—সামু!

—বলুন। কাছে এসে সেলাম করে দাঁড়াল সামু।

—কি রে, ছোঁড়াটাকে নতুন কিছু শেখালি ?

—না।

—না কি রে ?

—ছেলেটা বড় বেয়াড়া, কোন কথা শোনে না, খালি কাঁদে।

—ওসব বেয়াড়া-টেয়াড়া চলবে না। দরকার হলে চাবুক লাগাবি।

—জো হুকুম।

মিঃ ভাটিয়া উঠে গিয়ে ছেলেটাকে শেখাতে লাগলেন—অন্ধ লাচার বাবু, একটা পয়সা দয়া করে দেবেন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।

ভাটিয়া যতবার শেখান, ছেলেটা ততবার ভুল করে।

এবার রেগে গিয়ে মিঃ ভাটিয়া ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দেন তার গালে। গালে পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ বসে যায়।

কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারে না ছ'বছরের শিশু। সেও বুঝতে পারে এখানে কাঁদলে আর কেউ আদর করবে না। উপরন্তু, পিঠে আরও দু'তিনটে পড়বার ভয় আছে। তাই সে নির্বিবাদে ভাটিয়ার নির্দেশ মেনে যতটা সম্ভব কসরৎগুলো শিখতে লাগল। দেখে মিঃ ভাটিয়ার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, বললেন—বা-রে! এ তো বেশ বুলি বলছে!

সেখান থেকে আবার একটা ডিপার্টমেণ্টে গেলেন মিঃ ভাটিয়া।

সেখানে চলেছে প্রেম-লীলা। তার পরের ডিপার্টমেণ্টে চলেছে জুয়ার আড্ডা। ভূ-গর্ভের এই ঘরে সমাজের যে কত বড় জঘন্যতম কাজ হচ্ছে, তার খবর কেউ রাখে না। এইসব কাজ প্রত্যক্ষ করলে লোকে ভাবতে নিশ্চয়ই বাধ্য হবে যে এরা অদ্ভুত লোক!

এমন সব ভয়াবহ কাজ যে মানুষে করতে পারে তা মানুষের পক্ষে ভাবা সত্যিই অসম্ভব।

প্রতিদিন এভাবে সমস্ত ডিপার্টমেণ্টগুলি একবার ঘুরে দেখে মিঃ ভাটিয়া আবার তাঁর নিজের প্রাইভেট রুমে যান।

॥ দুই ॥

মিঃ ভাটিয়া যেমন তাঁর কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, পুলিশ বিভাগও কিন্তু তখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল না।

তাদেরও চেষ্টার অন্ত ছিল না। এই পুলিশ বিভাগের সাব-ইন্সপেক্টর সুবিমল অধিকারী একদিন একটি অভিনব উপায় বের করলেন।

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল সেদিন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলাল সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল। সুবিমল বললে—দীপকদা, এই গ্রীণল্যাণ্ড হোটেল নাইট ক্লাবের রহস্য ভেদ করার জন্য আমি একটি অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করেছি।

—বল, তুমি কি বলতে চাও।

—আমি বলি কি, আমি যদি ছদ্মবেশে ওদের দলে ঢুকে গিয়ে ওদের দলের সব কিছু জেনে নিয়ে তোমাদের জানাতে পারি তবে তোমাদের কাজের অনেকটা সুবিধা হবে।

সোল্লাসে মিঃ শেঠ বলে উঠলেন—তা যদি পারেন আমি আপনার প্রমোশন পাবার সব রকম ব্যবস্থা করে দেব।

—তা না হয় করে দিলেন। কিন্তু সে প্রমোশন পাবার সুযোগ কি ও পাবে? বললে দীপক।

—সে কথা বলছেন কেন ?

—বলছি এজন্য যে, যাদের কোন অপরাধের সূত্র আজ চার বছর ধরে চেষ্টা করেও বের করতে পারেননি, তারা যে কচি খোকা নয়, সেটা ভালো করেই বুঝতে পারছেন। তাই বলছি, ওর মত একটি অল্পবয়সী ছেলের পক্ষে সেই রহস্যের সমাধান সম্ভব হবে কি না কে জানে।

—সে তুমি ভেবো না দীপকদা, আমি ঠিকই পারব।

—পারবে না তা বলছি না। তবে প্রতি মুহূর্তে প্রাণের আশংকা থাকবে।

—পুলিশের চাকরি যখন নিয়েছি, তখন তো প্রাণটিকে হাতের মুঠোয় নিয়েছি।

—তা হলে এক কাজ করুন দীপকবাবু। বললেন মিঃ শেঠ।

—কি ?

—আপনি নিজেই একবার ওদের দলে ভিড়ে যাবার চেষ্টা করুন না।

—তাতে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। শেষ পর্যন্ত হয়তো আমাকে তাই করতে হবে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা হবে যে, আমায় ওরা এমনভাবে চেনে যে, দিনের পর দিন সেখানে আমার ছদ্মবেশে আত্ম-গোপন করে থাকা খুব কষ্টকর হবে। তাই আমি চাইছি কোন আন-কোরা নতুন পুলিস অফিসারকে ওখানে ঢোকাতে। যাকে ওরা কোনদিন দেখেনি বা চেনে না।

—আমিও তো নতুন এসেছি দীপকদা। বললে সুবিমল অধিকারী।

—কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ। এতবড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে তোমাকে পাঠাতে আমি ভরসা পাচ্ছি না।

—আমাকে একবার সুযোগ দিয়েই দেখুন না।

রতনলাল বললে—ও যখন এত করে বলছে, একবার দেখাই যাক না ওকে পরীক্ষা করে।

—বেশ, তাহলে মিঃ শেঠ, আপনি ওর যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

—করে আর দেব কি? ও কিভাবে যেতে চায় তা নিজেই ঠিক করবে। আজ থেকে এই থানার ডিউটি থেকে ওর ছুটি।

—বেশ, আমি তাহলে কাল থেকেই কাজটা আরম্ভ করে দেব।

মনের আনন্দে বেরিয়ে গেল সুবিমল অধিকারী।

* * *

পরদিন একটু বেলাতেই ঘুম থেকে উঠল সুবিমল। তারপর দিদির পারমিশন নিয়ে বেরিয়ে গেল সাধারণ পোশাকে।

তারপর পথে বেরিয়ে, একটা বস্তির ভেতরে গিয়ে মস্তান টাইপের একটি ছেলের কাছ থেকে মস্তানী ড্রেস চেয়ে নিয়ে তা পরে নেয়।

তার পরনে একটা ড্রেন-পাইপ প্যাণ্ট, তার রং আবার কালো। গায়ে আবার একটা লাল-সবুজ মেশানো বুক-খোলা গেঞ্জি।

ডানহাতে ঘড়ি আর বাঁহাতে একখানা লাল রুমাল বাঁধা। গলায় একখানা রুমাল বাঁধা। একটা মাউথ-অর্গ্যান বাজাতে বাজাতে সে চলেছিল রাস্তায়।

হঠাৎ পথে দেখা হয়ে গেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপকের সাথে।

—ও দীপকদা!

ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল দীপক। একটু অবাকও হলো, ঐরূপ একটা বখে-যাওয়া ছেলের মুখে তার নামটা উচ্চারিত হতে দেখে।

দীপককে কোনকিছু ভবেবার সুযোগ না দিয়ে দীপকের কাছে এগিয়ে এসে সুবিমল বললে—আমায় চিনতে পারছো না?

ভালো করে তাকিয়ে দেখে দীপক বললে—আরে সুবিমল না?

—হ্যাঁ।

—তোমায় যে চেনাই যায় না!

—ও, তাহলে তোমার চোখেও আমি ধুলো দিতে পেরেছি?

—তাইতো দেখছি।

—তবে আর ভয় নেই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর চোখে যখন ধুলো দিতে পেরেছি, তখন আর কেউই আমাকে চিনতে পারবে না।

—তাহলে এই বেশেই ওখানে যাবে?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, তাহলে রোজ একটা করে খবর দিও।

—তা দেব। তুমি কিন্তু দিদিকে একটু দেখো।

—সেকথা তোমায় আর বলে দিতে হবে না।

দীপক বেরিয়ে গেল। সুবিমল তার গন্তব্যস্থানের দিকে পা বাড়াল।

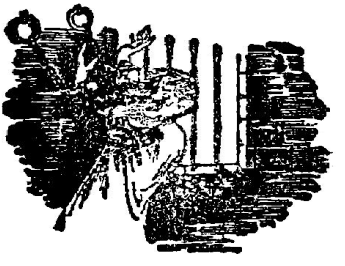

॥ তিন ॥

বেলা দশটা।

মিঃ ভাটিয়া তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী বীণার সাথে বাইরে বেরোবার পোশাক পরে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আলাপ করছেন।

এমন সময় দেখা গেল, একটা আওয়ারা টাইপের ছেলে মাউথঅর্গ্যান বাজাতে বাজাতে এসে দাঁড়াল তাঁদের কাছে।

তাঁদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে মিঃ ভাটিয়ার পকেট থেকে মানি-ব্যাগটা সে তুলে নিল।

ওরা এ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলে না।

বাজারে বাজার করতে গিয়ে দেখলেন তাঁর পকেটে মানিব্যাগটা

নেই। ভাবলেন, হয়তো ভুল করে বাড়িতে ফেলে এসেছেন। কিন্তু বাড়ি গিয়েও যখন সেটাকে পাওয়া গেল না তখন সত্যিই খুব ভাবনায় পড়লেন মিঃ ভাটিয়া।

দলের সবাইকে ডেকে এ-বিষয়ে তদন্তের জন্য বললেন তিনি।

সকলে চলে গেল, মিঃ ভাটিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন সেই ছেলেটা যে তাঁর অন্যমনস্কতার সুযোগে মানিব্যাগটা তুলে নিয়েছিল।

—এই নিন স্যার।

ব্যাগটা ফেরত পেয়ে খুশীতে ভরে উঠলো মিঃ ভাটিয়ার মুখ। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে টাকাটা বের করে দেখলেন যে সব টাকা ঠিক আছে।

অবাক হয়ে তিনি বললেন—তুমি নিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—ক'দিন কিছু খেতে পাইনি বলে।

—তবে ফেরত দিলে কেন?

—আরও কিছু পাব বলে।

—তার মানে?

—মানে, আমি একটা কাজ চাই আপনার কাছে।

—তা এইটে কি কাজ চাওয়ার রীতি?

—আজ্ঞে না, আমাদের পাড়ার পল্টুদা বলতো যে, যখন লেখাপড়া জানা না থাকে, তখন অন্য কোন বিষয়ে দক্ষতা বা সততা দেখিয়ে বড় বড় লোকের কাছে চাকরি পাওয়া যায়।

—আমার কাছে কেন? আরও তো বড় বড় লোক আছে এই শহরে।

—সকাল বেলায় আজ বেরিয়ে পড়েছিলাম একটা বড়লোককে পাকড়াও করবো বলে। হঠাৎ পথে আপনাকেই প্রথমে নজর পড়ে গেল, আর নজর পড়ল আপনার মানিব্যাগের দিকে।

—ও, তাহলে আমিই তোমার প্রথম শিকার ?

—শিকার বলছেন কেন ? বলুন চাকরির প্রথম ইণ্টারভিউ-অফিসার।

হো-হো করে বিকট হাসি হেসে মিঃ ভাটিয়া বললেন—আমি তোমায় একটা চাকরি দেব। তার আগে আমি তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন করবো ও কতকগুলো কাজে লাগাবো। কাজগুলি যদি ঠিকমত করতে পার তবে তোমাকে আমি মাইনে দিয়ে রাখব।

—বলুন আপনি কি জানতে চান ?

—তোমার বাড়িতে কে কে আছেন ?

—কেউ নয়।

—থাকার কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা আছে কি ?

—না।

—তবে এতদিন কোথায় ছিলে ?

—এতদিন ছিলাম পণ্টুদার আড্ডায়। কিন্তু সে ধরা পড়ে গেছে, তার বাড়িটাও বেদখল হয়ে গেছে। তাই আজ পথে বেরিয়ে পড়েছি।

—তা বেশ করেছো। আজ থেকে তুমি এখানে থাকবে, কাল থেকে কাজে লেগে যাবে।

—কিন্তু স্যার, আমি সম্প্রতি দক্ষিণের ঐ বস্তিতে আমার এক মাসীর কাছে থাকি। সেখানে এই শুভ খবরটা দিয়ে আসতে হবে, কাল সকালে আমি ঠিক চলে আসব।

—বেশ। জানবে এটাও তোমার একটা পরীক্ষা।

চলে যাচ্ছিল ছেলেটি। মিঃ ভাটিয়ার ডাকে সে আবার ফিরে আসে।

—তুমি যে আমার এখানে কাজে বহাল হয়েছ, একথা বাইরের কেউ যেন জানতে না পারে।

—সেকথা আপনাকে বলতে হবে না স্যার। তবে আমার খরচের জন্যে যদি কিছু···

—ওহো। এই নাও।

বলে, একখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিলেন ছেলেটির দিকে।

ও বেরিয়ে যেতেই মিঃ ভাটিয়া কলিং বেল টিপে ধরলেন।

হাজির হ'ল কানাই।—কি খবর বস্?

—এই মাত্র যে ছেলেটা বেরিয়ে গেল তাকে ফলো করো।

এতক্ষণ এই যে নিখুঁত অভিনয় করল, সে যে সুবিমল অধিকারী তা আর বলতে হবে না। রাস্তায় বেরোবার আগে সে ড্রেস পালটে ফেলে, ফলে তাকে চিনে বের করা কানাইয়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু সে তার সর্দারের কাছে এ খবর দেবে কি করে, তাই ভেবে উদ্দেশ্যহীন ভাবে কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘুরে এসে মিঃ ভাটিয়ার কাছে সুবিমলের প্রশংসা করে বললে—ওকে আমাদের দলে রাখলে আমাদের উপকারই হবে স্যার।

* * *

সুবিমলের আজকের অপূর্ব অভিনয়ের খুব তারিফ করল দীপক ও রতনলাল। কিন্তু সুবিমলের বোন বহ্নিদেবী খুব খুশী হতে পারলেন না। তিনি কেবল ভাবতে লাগলেন ভবিষ্যতের বিপদের কথা।

পরদিন সকাল বেলা সুবিমল অধিকারী তার আগের দিনের পোশাকে বেরিয়ে পড়ল তার নতুন কর্মস্থানে।

* * *

শুরু হয়ে গেল তার কাজ।

মিঃ ভাটিয়ার নির্দেশে তাকে যেতে হ'লো রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে রেল-লাইনের পাশে।

তখন রাত আটটা। সেই সময় একটা পার্শেল এসে পড়ল স্টেশনের পাশের জঙ্গলে। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে সুবিমল দেখল, তাতে কোকেন বা আফিম জাতীয় কি আছে। প্যাকেটটা হাতে তুলে নিয়ে হাসি পেল সুবিমলের।

কোথায় এই সব দুর্নীতি দমনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সে, আর আজ তাকেই কিনা এদের দলে ভিড়ে এই জঘন্যতম কাজ করতে হচ্ছে!

মালটা নিয়ে মিঃ ভাটিয়ার আড্ডায় দিয়ে আসতে সেদিন খুব বাহবা পেল সুবিমল।

মিঃ ভাটিয়া বুঝতে পারলেন, একে দিয়ে সত্যিই অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

পর পর কয়েকদিন এইভাবে নানান জায়গা থেকে নানা রকম মাল সংগ্রহের কাজে লিপ্ত রইল সুবিমল।

পুলিসও একে একে গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের সব রহস্যের সন্ধান জানতে লাগল সুবিমলের কাছ থেকে।

কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় মাল পাঠাতে গিয়ে, পর পর দু'লরি মাল ধরা পড়তে, মিঃ ভাটিয়ার সন্দেহ হ'লো। তিনি ভাবতে লাগলেন নিশ্চয় কেউ না কেউ তাঁদের সন্ধান পুলিসকে জানায়। তা না হলে কি করে পুলিস এত কর্মতৎপর হয়ে উঠল? আগেও তো বহু তাল তাল সোনা, মদ, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি নানান জায়গায় পাচার করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কোন-দিন তাদের ধরতে সক্ষম হয়নি। আর আজ কিনা পর পর ক'দিনেই দু'দুটো মালের লরি পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না?

একে একে ডাক পড়ল সকলের।

মিঃ ভাটিয়ার চোখ দুটো তখন হিংস্র জানোয়ারের মত জ্বলছে। প্রথমেই তিনি কানাইয়ের সামনে গিয়ে বললেন—কানাই, ব্যাপার কি? কি করে আমার মালের সন্ধান পুলিস জানতে পারল?

—আমি তা জানি না স্যার।

—জানি না। বলে রেগে একটা থাপ্পড় দিয়ে, গেলেন সামুর কাছে।

—সামু, তুই একাজ করেছিস?

—আজ্ঞে না।

—কেষ্ট ?

—আজ্ঞে না।

—বিশু ?

—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, তোরা যা সব। আমি দেখছি কে এসব করছে।

ওদিকে তখন ফোন করে সব কথা থানায় জানাচ্ছিল সুবিমল অধিকারী ওরফে বিজু।

তীক্ষ্ণধী মিঃ ভাটিয়ার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারল না সে।

সুবিমল অধিকারী কিন্তু এর বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না।

॥ চার ॥

পরদিন সকাল।

সুবিমল অধিকারী চা পান করছিল। তার দিদি তাকে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, আর কতদিন তোকে এভাবে গুণ্ডা-বদমায়েশের দলে থেকে কাজ করতে হবে ?

—না না, আর খুব বেশীদিন নয়। পুলিশ তো সব জেনেই গেছে।

—তবে আর তুই কেন ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছিস্?

—ওদের দলের সর্দার গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ওদের দলে থাকতেই হবে।

—কিন্তু আমার এসব একদম ভালো লাগছে না।

—তুমি ভয় পেয়ো না দিদি। তোমার আশীর্বাদ থাকলে আমার কোন ভয় থাকবে না। দিদিকে সান্ত্বনা দিয়ে সুবিমল থানায় যায়।

* * *

—তারপর, কি খবর অধিকারীবাবু? প্রশ্ন করেন মিঃ শেঠ।

—আজ্ঞে, খবর তো ভালই। তবে এখন আপনারা যদি কাজে লেগে যান—

—কাজে তো আমরা লেগেই আছি। আপনার নির্দেশমত ওদের মালগুলিকে পাচার হতে না দিয়ে সব আটক করে ফেলেছি।

—কিন্তু তাতে ত সমস্যার সমাধান হবে না।

—তা জানি।

—তাহলে আসল লোকগুলোকে গ্রেপ্তার করতে পারছেন না কেন?

—কি করে গ্রেপ্তার করি বলুন? উপযুক্ত প্রমাণ তো চাই।

—তা ঠিক।

—আচ্ছা ওদের লরির কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি?

—না

এমন সময় প্রবেশ করল দীপক ও রতনলাল।

—এই যে সুবিমল! আজ তুমি তোমার কর্মস্থলে যাওনি?

—যাব।

—হ্যাঁ, তুমি ঘন ঘন থানায় এসো না। ওদের সন্দেহ হতে পারে।

—কিন্তু আমি ত এখানে ইউনিফর্ম পরে আসি।

—তা আস। কিন্তু ওদের নজর সবদিকে আছে, এটা মনে রেখো।

—আচ্ছা।

—আর একটা কথা তোমায় বলি।

—বলুন।

—ওদের হোটেল থেকে কখনও ফোন করবে না। আমাদের সব ব্যাপার জানাতে হলে, কোন পাবলিক এক্স চঞ্জ থেকে ফোনে সব জানাবে।

—কিন্তু আমি তো ওদের ফোনেই সব কথা এযাবৎ আপনাদের জানিয়ে এসেছি।

—ওরা এটা জানতে পারেনি তো?

—আজ্ঞে না।

—দেখো। খুব সাবধান।

—আচ্ছা দীপকদা, তোমরা এবার মিঃ ভাটিয়াকে গ্রেপ্তার করছো না কেন?

—এখনও ভাই আমাদের হাতে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব আছে। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এত বড় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা সত্যিই দুঃসাধ্য।

—তাহলে আমাকে বলুন, আমি কি উপায়ে প্রমাণ সংগ্রহ করবো?

—তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তুমি যা করছো তাই কর। আমরা দেখছি কি করতে পারি।

—আচ্ছা, আমি তাহলে এখন আসি।

বেরিয়ে গেল সুবিমল অধিকারী।

* * *

সেইদিন রাত আটটা।

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব থেকে ফোন করে সব ব্যাপার পুলিসকে জানাচ্ছিল সুবিমল। এমন সময় এলো একটি পার্শ্বেল।

পার্শ্বেলটি তারই নামে।

সাগ্রহে কৌতুহলান্বিত হয়ে সেটাকে খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি কালকেউটে সাপ। আর সুবিমল কিছু বোঝবার আগেই সাপ তাকে দংশন করলো। সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

এদিকে ফোনটা তখনও ঝুলছে। তাতে ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে, হ্যালো হ্যালো···আমি দীপক বলছি। কি হলো সুবিমল ?

মিঃ ভাটিয়া পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে সব ব্যাপার জ্ঞাত করাচ্ছিল সুবিমল।

এখনই লাশটাকে সরিয়ে ফেলা উচিত। ডাক দিলেন তাই কানাই আর সামুকে।

—কানাই! সামু!

—বলুন স্যার।

—লাশটাকে বাক্সে ভরে থানায় পার্শেল করতে হবে। পারবি ?

—এ আর এমন কঠিন কি ?

—তবে যা, তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেল এটাকে এখান থেকে। এখনই হয়তো দীপক ও রতনলাল এসে যাবে।

ওরা সুবিমলের মরা দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলে ঘর থেকে বারান্দায়।

এর মধ্যে প্রাইভেট কার-এ করে হাজির হল দীপক ও রতন!

তাদের দেখে সাদরে আহ্বান জানালেন মিঃ ভাটিয়া।

—আসুন, আসুন দীপকবাবু। তা হঠাৎ এখানে কি জন্যে ?

—এমনি দেখতে এলাম আপনার ব্যবসাপত্তর কেমন চলছে।

—তা ভগবানের আশীর্বাদে মন্দ চলছে না।

মিঃ ভাটিয়ার সাথে দীপক কথা বলছে। কিন্তু নজর ওর চারি দিকে।

হঠাৎ দেখতে পেল মেঝেতে একটা দাগ। কোন লম্বা জিনিসকে সরাসরি টেনে নিয়ে গেলে যেমন দাগ হয়, এও ঠিক তেমনি দাগ।

দীপক সেদিকে এগিয়ে যেতেই মিঃ ভাটিয়া অদূরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে চোখ ইশারা করে দেওয়াতে সে পা ঘষতে ঘষতে চলে এল।

তাকে ঐ ভাবে হাঁটতে দেখে দীপক মনে কতকটা সান্ত্বনা পেল যে এই দাগটা ঐ ব্যক্তিরই পায়ের দাগ।

কিন্তু সন্দেহের নিরসন না হওয়াতে উঠে গেল। সেদিকে একটা জায়গায় মেঝেতে দেখলো একখানা পিতলের চাকতি পড়ে আছে।

সেটা সুবিমলের আইডেন্টিফিকেশনের চাকতি তা বুঝতে পেরে দীপক তার পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে নাক ঝাড়বার উদ্দেশ্যে। হঠাৎ হাত থেকে সেখানা সেখানে ফেলে দিল। তার পরে পিতলের চাকতি সহ হাত দিয়ে সেটাকে তুলে নিল সকলের অজান্তে।

বুঝতে পারল কিছুক্ষণ আগেও সুবিমল এখানে ছিল।

সুবিমলের যে একটা কিছু হয়েছে তা বুঝতে দীপকের বাকী থাকে না। দীপক এও বুঝতে পারে যে, তার যদি মৃত্যুও ঘটে থাকে, তবে সে লাশ ওরা এখনও সরাতে পারেনি।

তাই দীপক অস্থিরভাবে ঘরময় খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ঝুল-বারান্দার রেলিংয়ের পাশে সামু আর কানাই গল্প করছিল।

দীপক সেখান দিয়েও বার দুয়েক হেঁটে গেল।

কিন্তু কোন সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এল দীপক।

* * *

রাত দশটার সময় তার বাড়িতে এসে হাজির হলেন বহ্নি দেবী।

—একি, দিদি! তুমি?

—হ্যাঁ ভাই, আসতে হলো।

—কি ব্যাপার ?

—সুবিমল যে আজ এখনও বাড়ি ফেরেনি। দেরি হলে তো সে ফোন করে সব জানিয়ে দেয়।

—হয়তো কোন জরুরী কাজে আটকে পড়েছে।

—কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে।

—না না, ভয়ের কিছু নেই। তুমি বাড়ি যাও। আমি দেখছি কি করতে পারি।

বাহ্নি দেবীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে, গাড়ি করে বাড়িতে ফিরে এল দীপক।

কিন্তু স্বস্তি পেল না। সুবিমল যে মারা গেছে সে-বিষয়ে দীপক একেবারে নিঃসন্দেহ। সে তখনই ফোন করে সব বিষয় জ্ঞাত করাল মিঃ শেঠকে।

ফোনে মিঃ শেঠ জিজ্ঞেস করলেন—তাহলে আপনি এখন আমাকে কি করতে বলেন ?

আপনি পুলিশ ফোর্স নিয়ে বাড়িটাকে ঘিরে রাখুন। আমার স্থির বিশ্বাস, লাশ এখনও পাচার হয়নি। সেটা বাইরে যাবে। তাই কোনকিছু বাইরে বেরোলে সার্চ করবার চেষ্টা করবেন।

—আচ্ছা, তাই হবে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে আরাম-কেদারায় বসে একের পর এক সিগারেট ফুঁকতে লাগল দীপক।

ক্রমে রাতের মসিরেখা মুছে গিয়ে প্রকাশ পেল দিনের আলো।

শেষরাতের দিকে বোধ হয় একটু তন্দ্রার মতো এসেছিল তার।

তারপর কখন এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে।

* * *

হঠাৎ ফোনের ঘন ঘন আর্তনাদের শব্দে তার চেতনা ফিরে আসে।

ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং···

বেজে চলেছে ফোন।

সকালে আবার কোথা থেকে ফোন এল ?

বিরক্তিকর মেজাজ নিয়ে ফোন ধরলে দীপক। ওপাশ থেকে ভেসে এল বহ্নিদেবীর কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো·· দীপক স্পীকিং।

—আমি বহ্নি কথা বলছি।

—বল।

—সুবিমল কাল সারারাত বাড়ি ফেরেনি।

—তুমি কিছু ভেবো না দিদি। আমি এখনিই খোঁজ নিয়ে আসছি।

বহ্নিদেবীকে আশ্বাস দিয়ে ফোন নামিয়ে রাখতেই আবার বেজে উঠলো ফোন।

—হ্যালো দীপক স্পীকিং।

—আমি মিঃ শেঠ বলছি। কাল সারারাত পাহারা দিয়েও হোটেল থেকে কাউকে বাইরে বেরোতে দেখা যায়নি। কিন্তু আজ সকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।

—কি ব্যাপার ?

—আজ সকালে আমাদের থানার পেছনে একটা বড় প্যাকিং বাক্স পাওয়া গেছে।

—সেটা খুলেছেন ?

—না। আপনি এলেই খোলা হবে।

—বেশ, আমি এক্ষুণি আসছি।

* * *

মিনিট দশেকের মধ্যেই থানায় গিয়ে পৌছাল দীপক ও রতন।

ওদের সামনেই খোলা হলো সেই প্যাকিং বাক্সটা। তার ভেতর

ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে বের হলো সুবিমলের বিকৃত লাশ। তার জামার সাথে পিন দিয়ে আঁটা একটি চিঠি।

তাতে লেখা : বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি।

দীপক মাথায় হাত দিয়ে বসলো। ভাবতে লাগল বহ্নিদেবীকে এখন সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে। দীপক ভাবতে লাগল সে নিজে কেন গেল না? কেন সে একটা দুধের শিশুকে অত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের মাঝে সঁপে দিয়েছিল?

বহ্নিদেবীকে খবর দেওয়া হলো। তিনি এসে ভাইয়ের লাশের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পেল না দীপক। কি সান্ত্বনা দেবে সে? বহ্নিদেবী তো বার বার ভাইকে ওখানে যেতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু দীপকের সাহস পেয়েই তো সে গেল।

দীপকের এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে মিঃ ভাটিয়ার গলা টিপে ধরে। কিন্তু বিপদে ধৈর্য হারালে চলে না। তাই সে ধৈর্য ধারণ করল।

তাকে ধীরে ধীরে এগোতে হবে সব কাজে। মাথা ঠিক রাখতে হবে। তাই সে নিজেকে স্থির রাখল অনেক কষ্টে।

* * *

ধীরে ধীরে দীপক এগিয়ে গেল বহ্নি দেবীর কাছে, সাহসের সুর তার কণ্ঠে।

বললে—ওঠো দিদি। বাড়ি চল। কেঁদে আর কি হবে—কোন লাভ নেই। যা হবার তা ত হয়েই গেছে। যে গেছে সে ত আর ফিরে আসবে না।

—তা জানি। কিন্তু দীপক, বাড়ি ফিরে গিয়েই বা আমি কি করব?

—কেন?

—বাড়িতে আমার আর কে আছে বল? তার চেয়ে তোমরা আমাকে সুবিমলের সাথেই এক চিতায় তুলে দাও।

—তাই কি হয় দিদি? তার চেয়ে মনকে দৃঢ় কর। কায়মনে ভগবানের কাছে তুমি প্রার্থনা কর, যেন তোমার ভ্রাতৃ-হত্যাকারীর শাস্তি স্বচক্ষে দেখে যেতে পার।

—বেশ। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বহ্নি দেবী।

তারপরে মনে মনে বোধ হয় একটা দৃঢ়সংকল্প করলেন।

বললেন—তুমি পারবে দীপক, আমার ভাইয়ের হত্যাকারীর শাস্তি দিতে? তাকে ধ্বংস করতে?

—চেষ্টা করব নিশ্চয়ই।

মনে মনে একটা দৃঢ়সংকল্প নিলেন বহ্নি দেবী। তারপর বললেন—বেশ, চল বাড়ি যাই। বহ্নি দেবীকে বাড়িতে পৌঁছে দিল দীপক।

দৃঢ়সংকল্প করে দীপক, যেমন করেই হোক, অপরাধীর শাস্তিবিধান তাকে করতেই হবে—এ তার কর্তব্য।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন দীপক সকালে চা খেয়ে সংবাদপত্রের পাতায় মন দিল।

নানান সংবাদ—

তার মধ্যে একটা সংবাদ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

তা হলো: বিখ্যাত একজন প্রিন্স কয়েকদিন আনন্দ করার জন্যে আসছেন এখানে।

যদিও নেটিভ ষ্টেট এখন ভারতে নেই—তবুও সব প্রিন্সরা মোটা টাকা মাসিক খরচ পান।

দীপক খবরটা পড়ে মনে মনে একটা প্ল্যান স্থির করে ফেলল।

পরবর্তী কাজের প্রোগ্রামও তক্ষুণি স্থির করে ফেলল সে।

এমন সময়—

ঘরে প্রবেশ করল তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল।

—কি খবর রে ?

—চিঠি। আজ এলো এগুলো।

—দে আমাকে।

এক এক করে চিঠিগুলো পড়তে লাগল দীপক।

হঠাৎ একটা চিঠি তার মনকে যেন বিচলিত করে তুলল।

নীল কাগজে টাইপ করা খামে ভরা চিঠি। তাতে লেখা :

মাননীয় গোয়েন্দা মশাই,

আপনি যে খুব বুদ্ধিমান, আমি তা জানি।

কিন্তু তাই বলে আমার পেছনে লাগা উচিত নয় আপনার।

আমাদের দলটি সর্বভারতীয় দল—তার কাছে আপনি শিশু।

তাই বলছি, সাবধান! অনর্থক আমার পেছনে লেগে নিজের জীবন বিপন্ন করবেন না।

আমি চাই না আপনার কোন ক্ষতি করতে। কিন্তু যদি পেছনে লাগেন, তাহলে কি করে পথের কাঁটা সরাতে হয় তা ভাল করেই জানি আমি। এটা আমার শেষ সতর্কবাণী মনে রাখবেন।

যদি এদিকে মাথা না দেন, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ দশ হাজার টাকা আমি ঠিক পৌঁছে দেব আপনার হাতে।

আশা করি, আমাদের কথা আপনি মেনে চলবেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী বন্ধু

চিঠিটা ইংরাজীতে টাইপ করা।

দীপক দু'বার পড়ল সেটা। তারপর ডাকল—রতন!

রতন ছিল পাশের ঘরে। সে এগিয়ে এসে বললে—কি রে?

—এই দেখ।

রতন চিঠিটা পড়ল। পর পর দু'বার।

তারপর বললে—তুই তাহলে ঠিকমতই একটা ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছিস।

—তা ঠিক।

—ফল হবে কি?

—আশা করি হবে।

—কিন্তু ভয়ও আছে খুব।

—তা জানি। দেখা যাক্ কতটা কি করা যায়।

দীপক চিন্তিত হলো।

* * *

ঘণ্টা দুই পরে।

দীপকের বাড়ির টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্ ঝন্ শব্দে।

ফোন তুলল দীপক।

—হ্যালো···কে?

—আমি একজন শুভানুধ্যায়ী।

—নাম?

—নামে কি প্রয়োজন? আমার চিঠিটা কি পেয়েছেন আপনি?

—হ্যাঁ।

—আমি আপনার মতামত জানতে চাই।

—কি বিষয়ে?

—আপনি কি এসব ছেড়ে দিতে রাজী আছেন? সত্যি কথা বলুন।

—চিন্তা করছি।

—চিন্তা নয়, এ কেস ছাড়লে নগদ দশ হাজার টাকা পাবেন।

—ঠিক ত ?

—নিশ্চয়ই।

—বেশ, তবে আমি এ কেস থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী।

—অলরাইট। আমি সাতদিন দেখব। তার পরে দশ হাজার টাকা পাঠাব।

—ধন্যবাদ।

দীপক ফোন ছেড়ে দিল।

কিন্তু সে কি সত্যিই এ কেস ছেড়ে দেবে ? সে মনে মনে ভাবতে লাগল।

পাশে ছিল রতনলাল।

সে বললে—কি ব্যাপার রে ?

—কেন ?

—তুই এ কেস সত্যিই ছেড়ে দিবি ?

—কে বললে ?

—এই যে ফোন করলি ?

—দূর, বাজে কথা।

—তবে বললি কেন ?

—কারণ আছে।

—কি কারণ ?

—আমি যেতে চাই আরও গভীরে। তাই ওদের খেলাচ্ছি আমি।

—তা মন্দ নয়।

রতন হেসে উঠল।

দীপক ধীরে ধীরে তার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে স্থির করতে লাগল।

॥ ছয় ॥

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব।

সামনের আলোগুলি ঠিক তেমনিভাবেই জ্বলছে আর নিভ্‌ছে।

তেমনি সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকের আনাগোনা চলছে সেখানে।

আর এই সব গণ্যমান্য ভদ্রলোকের খেলাধূলার মধ্যে আজ দেখা গেল নতুন একজন লোককে। তাকে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি।

সকলে তাকাল এই নতুন লোকটির দিকে।

অপূর্ব বেশভূষা।

সঙ্গে একজন লোক—সে হলো তাঁর পি-এ।

লোকটি কাউণ্টারে গিয়ে একখানা কার্ড দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে এগিয়ে এলেন মিঃ ভাটিয়া স্বয়ং।

তিনি নবাগত ভদ্রলোক ও তাঁর সহকারীর দিকে এগিয়ে তাঁদের আপ্যায়ন করে বসিয়ে খাবারের অর্ডার দিলেন।

তারপর দাঁড়ালেন মাইকের সামনে।

উপস্থিত ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি এই নবাগত ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বললেন—ভাইসব! আজ আমাদের ক্লাবের সভ্যের আসনে যে নতুন লোকটিকে দেখছেন, তাঁর পরিচয় জানবার জন্যে নিশ্চয়ই উন্মুখ হয়ে আছেন আপনারা।

আমাদের সামনে যিনি এসেছেন—ইনি একজন প্রিন্স। ইনি সবে এসেছেন, তা নিশ্চ ই কাগজে পড়েছেন। আর সঙ্গে যিনি, তিনি হলেন ওঁর পি-এ।

সকলে দু'জনকে অভিনন্দন জানাল এঁরাও জানালেন যে এরূপ অভিজাত ক্লাবের সভ্য হতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করলেন তাঁরা।

সকলের সামনেই এঁরা ক্লাবকে পাঁচশো টাকা ডোনেশন দিলেন।

করতালি-ধ্বনিতে মুখর হলো জনগণ।

মিঃ ভাটিয়ার কানে কানে কি যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বললেন প্রিন্স। তিনিও প্রত্যুত্তরে কি যেন বললেন। তারপর প্রিন্সের হাত ধরে চলে গেলেন উপরে।

উপরে নিজের ঘরে গিয়ে বসে বললেন মিঃ ভাটিয়া—আপনি কি রকম খেলায় অভ্যস্ত ?

—সব রকমই খেলি।

—সব রকম ব্যবস্থাই এখানে আছে। তবে একটা কথা—

—বলুন, কি বলতে চান ?

—আমাদের এই গুপ্ত আড্ডাটার সংবাদ আমরা সাধারণতঃ কাউকে জানাই না। কেন জানাই না তা তো আপনারা জানেন।

—তা জানি। পুলিশের চোখ এড়িয়ে চলা বড় কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সুস্থ মনে কোথাও খেলতে পারি না।

—তা যা বলেছেন। বুঝতে পারছি, আপনিও সব জানেন।

—নিশ্চয়ই।

—নতুন এসেছেন, তাই চোখ-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হবে।

—বেশ, তাই হবে।

ওঁদের চোখ বেঁধে দেওয়া হলো। ওঁরা বুঝতে পারলেন যে ওঁরা নিচে নেমে যাচ্ছেন।

হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে ওঁরা দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তারপর খুলে দেওয়া হল চোখের বাঁধন।

ওঁরা বুঝতে পারলেন যে ভূ-গর্ভস্থিত একটি ঘরে পৌঁছেছেন।

একটা আলোকমালা সজ্জিত ঘরে গিয়ে পৌছালেন ওঁরা। দেখলেন, দলের লোক এখানে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। অনেক ভদ্রবংশজাত যুবক, এমনকি যুবতীও আছেন এখানে।

একটি মেয়ে গান গেয়ে পানীয় সার্ভ করছে, আর এদের আনন্দ বিধান করছে।

প্রিন্স ও তাঁর সহকারীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মিঃ ভাটিয়া অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির।

মিঃ ভাটিয়া নিজে একজন পাকা খেলোয়াড়। তিনি নিজে আবার খুব মোটা মালদার লোক ছাড়া কারও সাথে খেলেন না।

আজ তাই তিনি নিজেই খেলতে বসলেন প্রিন্সের সাথে।

প্রথম দুই বাজী প্রিন্স জিতে নিলেন। কিন্তু তারপর প্রায় দু'হাজার টাকা হেরে বিদায় নিলেন।

আবার তাঁরা চোখ-বাঁধা অবস্থায় স্বস্থানে ফিরে এলেন।

আগামীকাল আসবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁরা ফিরে গেলেন।

* * *

পরদিনও এলেন প্রিন্স। কিন্তু আজ আর তাঁর সহকারী সাথে আসতে পারল না।

তাঁকে একা দেখে মিঃ ভাটিয়া বললেন—আজ আপনি একা যে? আপনার সহকারীটিকে কোথায় রেখে এলেন?

—সে অসুস্থ, তাই আজ আসতে পারেনি।

মিঃ ভাটিয়ার ঘরে গিয়ে প্রিন্স বললেন—আজ কি চোখ খোলা অবস্থায় যেতে পারব?

—আরও কয়েকটা দিন থাকুক না স্যার।

—বেশ, আপনার যা অভিরুচি।

চোখ বাঁধবার আগেই চারিদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখে কাথায় কি আছে তা ভাল করে বুঝতে পারলেন।

সেদিন কিন্তু বেশ কিছু টাকা জিতে নিয়ে ফিরলেন প্রিন্স।

* * *

কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন ঘটল বিপর্যয়। খেলতে খেলতে হঠাৎ পকেট থেকে রুমাল বের করে, চোখের গগলশ্‌টা খুলে মুছতে যেতেই পড়ে গেল আইডেন্টিটি কার্ডটা। তাতে পরিষ্কার অক্ষরে খোদিত আছে:

দীপক চ্যাটার্জী। প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

সেটির প্রতি নজর পড়তেই পকেটে হাত ঢোকাতে গেলেন মিঃ ভাটিয়া।

তার আগেই দীপক পিস্তল বের করে লাইটের ডুম ফায়ার করার সাথে সাথে ঘরটা অন্ধকারে ভরে গেল।

টেবিলসুদ্ধ ঠেলে দিল মিঃ ভাটিয়ার গায়ে। তিনি পড়ে গেলেন।

মিঃ ভাটিয়া অন্ধকারের বুকেই একবার পিস্তল ফায়ার করলেন।

কিন্তু কোনও সাড়া নেই। কেউ বুঝতে পারল না গুলি লাগল কি না।

ওদিকে প্রিন্সবেশী দীপক হাতড়াতে হাতড়াতে দেওয়ালের একটা সুইচ টিপে দিল। দেখা গেল, একটা সুড়ঙ্গপথ।

সেই পথ ধরে সে বের হয়ে এলো গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের পিছন দিকে।

দীপক বুঝতে পারলে, পুলিশের পাহারা সত্ত্বেও কি করে সেদিন মিঃ ভাটিয়ার লোকেরা থানাতে ঐ লাশটা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

* * *

সেখানে রতন তার জন্য অপেক্ষা করছিল চুপ করে দাঁড়িয়ে।

দীপক বুঝতে পেরেছিল যে এখানে একটা বিপদ ঘটতে পারে।

তাই সে রতনকে বলে দিয়েছিল, দশটা থেকে বারোটার মধ্যে যদি আমি না ফিরি, তাহলে যেন সে পুলিশ নিয়ে ক্লাবে যায়।

তাই রতন এসেছিল।

সে দীপককে পেছনদিক দিয়ে বেরোতে দেখে অবাক হলো।

বললে—কি খবর রে?

—খবর খারাপ নয়।

—কোনও বিপদ হয়নি ত?

—হয়নি, তবে হতে যাচ্ছিল।

—কি রকম?

—চল, বলছি।

চলতে চলতে দীপক একে একে সব কথা বললে রতনকে।

সব শুনে রতন ত অবাক।

বললে—এবার তাহলে তুই কি করতে চাস্ দীপক?

—ভাবছি।

—কি ভাবছিস?

—ভাবছি, এবারে আর একটা নতুন চাল চালতে হবে।

—আচ্ছা, একটা কথা—

—কি?

—মিঃ ভাটিয়াই কি দলপতি?

—না।

—তবে?

—সে খেলার পুতুল মাত্র।

—তবে দলপতি কে?

—ধীরে, রজনী, ধীরে—সব জানতে পারবে।

বলে, দীপক হেসে উঠল।

॥ সাত ॥

সকাল সাতটা।

কাগজের পাতায় বড় বড় হরফে একটি অদ্ভুত খবর প্রকাশিত হলো।

শহরে এক নতুন ধরনের চুরি সংঘটিত হচ্ছে। সম্প্রতি একজন দুষ্কৃতিকারী শহরের সব বড় জুয়েলারদের তার বাড়িতে আপ্যায়ন করে ভোজের ব্যবস্থা করছে।

জুয়েলারীর মালিক যখন দোকান বন্ধ করে সেই ভদ্রলোকের বাড়ির আনন্দে মশগুল হয়ে উঠেছে, তখন কে বা কারা তাদের দোকানের সব দামী দামী গহনাপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। পর পর তিনটে ঘটনা এরূপ ঘটেছে।

যে বাড়িতে জুয়েলারীর লোকেরা সব নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়, পরদিন সন্দেহক্রমে পুলিশ সে বাড়িতে খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারে যে, বাড়িটির ভাড়াটে তিন মাসের ভাড়া অ্যাডভ্যান্স দিয়ে মাত্র তিনদিন হ'লো চলে গেছে।

খবরটা দীপক ও রতনলালকে বেশ ভাবিয়ে তুললো।

দীপক বললে—এও মিঃ ভাটিয়ারই কাজ।

—আমরাও তো তাই মনে হয়। বললে রতন।

—কিন্তু এর তো একটা বিহিত করতেই হবে। তা না হলে দিনের পর দিন এইভাবে অত্যাচার চালিয়ে যাবে ওরা।

—তাই তো দেখছি।

—তাহলে কি করবি ঠিক করলি ?

—এখনও কিছু ঠিক করিনি। তবে কাল থেকে তুই সব বড় বড় জুয়েলারদের সাথে আলাপ জমিয়ে তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার চেষ্টা করবি।

—আর তুই ?

—আমি আবার গ্রীণল্যাণ্ড হোটেলে হানা দেব।

—কিন্তু তোকে তো ওরা চিনে ফেলেছে।

—তা ফেলুক, আবার অন্য ছদ্মবেশে সেখানে যাব।

—তাহলে আমি আমার কাজে লেগে যাই ?

—হ্যাঁ।

* * *

রাত বারোটা।

দীপকের শোবার ঘরে দীপক গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল।

ক'টা দিন পর পর নাইট ক্লাবে হানা দেবার দরুন তার রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি। তাই আজ সে খুব সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা খুট করে আওয়াজ হতেই তার ঘুম ভেঙে গেল।

দীপকের ঘুম খুব পাতলা। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যেতে সে বিছানার ওপরে উঠে বসলো।

অন্ধকারে বাইরের দিকে দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে দিয়ে বুঝতে পারল, কে যেন দরজা খোলবার চেষ্টা করছে।

আলো জ্বালালো না দীপক, যদি আততায়ী ভেতরে না ঢুকে পালিয়ে যায়, তাই সে পাশ-বালিশটাকে মানুষের মত করে শুইয়ে রেখে দিয়ে নিজে দরজার পাশে দাঁড়াল।

দরজা খুলে আততায়ী ঢুকলো ঘরে। সেও আলো জ্বালালো না। টর্চ জ্বালিয়ে দেখলো বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছে দীপক।

অন্ধকারের মধ্যেই সে কোমর থেকে ছোরা বের করল। চক্-চক্ করে উঠলো হাতের ছোরাখানা।

মনের আনন্দে আমূল বসিয়ে দিল বিছানায় শোয়ানো বালিশের ওপর।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠলো। লোকটির পিছনে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—হ্যাণ্ডস্ আপ!

হাতের ছুরি ফেলে দিয়ে, সোজা ওপরের দিকে হাত দুটি তুলে দাঁড়াল লোকটি। তার পরেই দীপক চীৎকার করে তার চাকর ভজুয়াকে ডাকলো। তারপর দুজনে মিলে তাকে ওখানেই বেঁধে রাখল।

পরদিন সকাল।

থানায় হাজির করা হ'লো লোকটিকে।

শুরু হলো জেরা। —তোমার নাম?

লোকটি চুপ করে থাকে।

—কি, শুনতে পাচ্ছ না? ভালো কথায় শুনতে পাবে না বলে মনে হচ্ছে। এই রামসিং, চাবুকটা নিয়ে এস।

চাবুক নিয়ে যমদূতাকৃতি রামসিং এসে দাঁড়াল লোকটির সামনে।

সাক্ষাৎ যমদূতকে কাছে দেখলে যেমন ধড়ে প্রাণ থাকে না, এই লোকটির অবস্থাও ঠিক তাই হলো।

সে তখন বলতে শুরু করল—আমার নাম কানাই।

—কোথায় কাজ করিস তুই?

—আজ্ঞে, গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবে।

—কে তোকে এখানে পাঠিয়েছে?

—আজ্ঞে…

কথা আর বের হয় না তার মুখ দিয়ে। হঠাৎ একটা গুলির আওয়াজ শোনা যায়, আর কানাইয়ের জ্ঞানহীন মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।

দীপক আততায়ীকে লক্ষ্য করে পিস্তল নিয়ে ছুটে যায়।

তাকে বাধা দেন মিঃ শেঠ। আর গিয়ে কি হবে? ওর নাগাল এখন আর পাবেন না। আমাদের আগে থেকেই সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

—কিন্তু এখন কি করা যায়?

—করার আর এখন কিছুই নেই। তবে গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের চারদিকে এখন থেকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখা উচিত।

—কিন্তু সেটা আরও বিপজ্জনক হবে।

—কেন?

—কারণ, আমরা যে ওদের ব্যাপারটা জানতে পেরেছি। এটা ওরা জানুক, এ আমি চাই না।

—কিন্তু দীপকবাবু, ওরা এ ব্যাপার জেনে ফেলেছে।

—জেনে ফেলেছে?

—হ্যাঁ। আর জেনে ফেলেছে বলেই আপনাকে হত্যা করতে লোক নিয়োগ করেছিল।

—তা ঠিক। কিন্তু ওরা তো একথা জানে না যে, পুলিশও ঐ হোটেলটার উপরে নজর রেখেছে।

—না, তা জানে না।

—আর তাই জানে না বলেই ওরা অবাধে নানারূপ দুষ্কৃতিমূলক কাজ করে চলেছে, চলবেও। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের।

—তাহলে আপনি কি ভাবে ওদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হতে বলেন?

—আমার মনে হয় ঐ হোটেলের চারপাশে সাধারণ পোশাকে পুলিশ ওদের গতিবিধির উপরে নজর রাখুক, যাতে করে জানতে না পারে যে এরা পুলিশের লোক।

—কিন্তু ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেটা করা কি সম্ভব?

—কেন নয়?

—বুঝতেই তো পারছেন যে, যারা থানার ভেতরে পুলিশের

নজর এড়িয়ে এভাবে প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে একজনের জীবন শেষ করে দিতে পারে, তারা অনেক কিছুই পারে।

—ওরা যে আমাদের চেয়ে কম শক্তিশালী তা আমি বলছি না! তবে আমরা এবার থেকে সচেতন হব।

—তাহলে কাল থেকে ছদ্মবেশে পুলিসকে ওখানে মোতায়েন রাখব।

—হ্যাঁ। তাই রাখুন।

এখান থেকে দীপক পথে বেরিয়ে ভাবতে লাগল, কি করে রহস্যের সমাধান করবে। জীবনে এমন ব্যর্থতার সম্মুখীন ও কোনদিন হয়েছে কিনা সন্দেহ।

চোখের সামনে পর পর দু'দুটো খুন হয়ে গেল। অথচ সে কিছুই করতে পারল না। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে সে নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়তে লাগল।

॥ আট ॥

সেইদিন সন্ধ্যে সাতটার সময় দেখা গেল একটা ছেঁড়া তালিমারা শার্ট ও ছেঁড়া প্যাণ্ট পরা, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে রাস্তার সামনে অর্থাৎ গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের সামনে ভিক্ষা করছে একটা লোক।

মিঃ ভাটিয়া যেন বাইরে কোথায় গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই তাঁর সামনে গিয়ে ব্যাঁ ব্যাঁ করে চিৎকার করতে লাগল ভিখিরীটা।

লোকটা যে বোবা তা বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা যায়।

মিঃ ভাটিয়া তাকে একটা টাকা বখশিশ দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু

লোকটা ব্যাঁ ব্যাঁ করে তার পেটে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, তার ক্ষিদে পেয়েছে, সে টাকা চায় না, কিছু খেতে চায়।

মিঃ ভাটিয়া ইশারায় তাকে বোঝাতে চাইলেন যে, সে কাজ করবে কি না। লোকটি আনন্দে তাতে রাজী হয়ে গেল।

ঐ বোবা লোকটি কাজ পেল ঐ গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবে, বেয়ারার কাজ।

কয়েকটা দিন বেশ মনোযোগ দিয়ে সে কাজ করল। তবে রাতে সে ক্লাবে থাকতো না। বলেছিল, তার বুড়ি মা বাড়িতে একা থাকেন, তাই তার পক্ষে বাইরে রাত কাটানো সম্ভব নয়।

একদিন হোটেলের ভেতর আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। অন্যান্য বেয়ারারাও আনন্দে প্রচুর পরিমাণে ড্রিঙ্ক করল। কিন্তু এই বোবা বেয়ারাটি ভুলেও এতটুকু মদ স্পর্শ করল না। উপরন্তু এইসব মাতাল বেয়ারাদের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিল।

মনের আনন্দেই কাজ করে যাচ্ছিলেন মিঃ ভাটিয়া। হঠাৎ আবার গত রাতে তাঁর একটা মালের গাড়ি ধরা পড়াতে তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেল।

আবার ডাক পড়ল তাঁর ঘরে দলের সব লোকের।

সকলেই বললে তারা কিছুই জানে না।

তখন ডাকা হলো সেই বোবা লোকটিকে। সে সত্যিকার বোবা কি না জানবার জন্য তার কানের কাছে জোরে ফায়ারিং করলেন মিঃ ভাটিয়া। কিন্তু তাতে লোকটি এতটুকুও কেঁপে উঠলো না দেখে বুঝেতে বাকি রইল না মিঃ ভাটিয়ার যে লোকটি সত্যিই বোবা এবং কালা।

কিন্তু তবে কে তাদের এ সর্বনাশ করল? কে তাদের মালসমেত লরির সন্ধান পুলিশকে দিল?

সেইদিন অনেক রাত অবধি জেগেও যখন মিঃ ভাটিয়া কোনরূপ কিছু করতে সমর্থ হলেন না তখন আকণ্ঠ মদ্যপান করলেন।

সকলে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুমোল না শুধু সেই হাবা কালা

বেয়ারাটি। সেও আজ অন্যান্য বেয়ারাদের সাথে মদ্যপানের অভিনয় করেছে। নেশায় ঢুলু-ঢুলু হয়ে পড়েছে।

যখন দেখলো সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মিঃ ভাটিয়ার ঘরে।

অত্যধিক মদ্যপান করার জন্যে মিঃ ভাটিয়া ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দরজাও খোলা ছিল। বোবা কালা বেয়ারাটি সেই সুযোগ সোজা তাঁর ঘরে ঢুকে পড়ে তাঁর টেবিলে কি খুঁজতে লাগল যেন।

টেবিলের ড্রয়ার খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একখানা ডায়েরী।

সেখানা পকেটে পুরে নিয়ে, সবার অলক্ষ্যে সে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে এল গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব থেকে।

তার এ রহস্যের সন্ধান আর কেহ জানলো না।

পরদিন। মিঃ ভাটিয়াকে কি রকম গম্ভীর দেখাতে লাগল। তাঁর যে ডায়েরী চুরি হয়েছে, এ খবর কেউ জানতে পারল না।

সেই হাবা কালা বেয়ারাটি ভাবতে লাগলো, এত বড় একটা চুরির খবর ও চেপে গেল কেন?

রাতেও মিঃ ভাটিয়া খুব খোঁজাখুঁজি করলেন তাঁর ডায়েরীখানা।

বোবা কালা বেয়ারাটির নজর এড়ালো না।

সেইদিন গভীর রাতে। মিঃ ভাটিয়া হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন একা। হাবা কালা বেয়ারাটিও অনুসরণ করল তাকে।

মোটর প্রস্তুতই ছিল। মিঃ ভাটিয়া উঠে বসলেন, হাবা কালা বেয়ারাটি সেই মোটরের পেছন দিকের ডালা উঠিয়ে তার ভেতর আত্মগোপন করল।

ছুটে চলল গাড়ি তীব্র বেগে।

শহরের শেষ প্রান্তে গঙ্গার ধারে একটা বিরাট বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা তার একটানা গতির বেগ কমাল।

গাড়িটা নিয়ে সোজা মিঃ ভাটিয়া বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লেন।

কেউ তাঁকে বাধা দিল না। উপরন্তু, গেটের দারোয়ান তাঁকে সেলাম করল।

বোঝা গেল, এখানে মিঃ ভাটিয়া প্রায়ই আসেন এবং এরা এঁর খুব পরিচিত। এ বাড়িটা শহরের অনেকেরই পরিচিত বাড়ি। শহরের সবচেয়ে বড় ধনী শেঠ শান্তিরামের বাড়ি এটা।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়িটাকে রেখে সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন মিঃ ভাটিয়া।

কিন্তু সেই হাবা বোবা বেয়ারাটি তো আর মিঃ ভাটিয়ার মত সোজা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে পারে না। তাই তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, খুব সতর্কতার সাথে চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাড়িটার পেছনের দিকে যেতে হ'ল।

তারপর পাইপ বেয়ে উঠতে থাকে ওপরে। পাইপ বেয়ে সে যেভাবে ওপরে উঠল, তাতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সে এ ব্যাপারে অভ্যস্ত।

দোতলায় উঠে ঘরের কার্নিশ ধরে ধরে এগিয়ে গেল সে।

হঠাৎ একটা ঘরের ভেতরে দুটি লোকের কণ্ঠস্বর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে সেখানে।

বাইরের অন্ধকার থেকে ভেতরের আলোতে তাদের দেখতে খুব কষ্ট হয় না।

সেই হাবা কালা লোকটি দেখতে পেল, ঘরের ভেতর মুখোমুখি বসে আছে শেঠ শান্তিরাম আর মিঃ ভাটিয়া।

শেঠ শান্তিরাম বলছেন—মাল এনেছো?

—এনেছি। তবে এবার কিন্তু নগদনারায়ণ দিতে হবে।

—কেন, আমি কি তোমাকে টাকা নিয়ে বেশী ঘোরাই?

—না, তা বলছি না। এবারে আমি সব বিক্রি করে দিয়ে কিছু-দিনের জন্যে ইউরোপ সফরে যেতে চাই।

—হঠাৎ?

—হ্যাঁ ভাই, এখানে থাকা এখন বিপদ। এখানে থাকলে পুলিশের নজর এড়িয়ে কাজ করা সত্যিই কঠিন।

—বল কি? মিঃ ভাটিয়ার মত লোকের আবার কিসের ভয়? তিনি আজ বিশ বছর ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আসছেন।

—হ্যাঁ ভাই, আমি সত্যি বলছি। ঐ ব্যাটা টিকটিকি দীপকই আমায় এ শহর ছাড়াবে।

—বল কি? ঐ একটা ছোকরাকে সরিয়ে দিতে পার না?

—চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করছি না। কিন্তু তবুও তা পারছি না। তুমি ত জান সে একদিন প্রিন্স সেজে আমার জুয়ার আড্ডায় এসে সব দেখে গেছে।

—বল কি! তুমি তাকে ধরতে পারনি?

—না। প্রথম তিনদিন আমি বুঝতেই পারিনি, পরে যখন বুঝতে পারলাম সে তখন নাগালের বাইরে।

—তাহলে তো ভাবনার বিষয়।

—আরও শুনবে? এরপর সে গতকাল রাতে আমার ঘরে হানা দিয়ে, আমার ডায়েরীটাও চুরি করে নিয়ে গেছে।

—তুমি কি তোমার ঐ ডায়েরীতে সব কথা লিখতে নাকি?

—হ্যাঁ, ডায়েরীতে তো লোক প্রাণ খুলে সব কথা লেখে।

—আচ্ছা, তুমি কবে নাগাদ যেতে চাও?

—টাকাটা যদি আজ বা কাল পেয়ে যাই, তবে আগামী পরশু আমি প্লেনের টিকিট বুক করব।

—বেশ, তুমি কাল টাকা পেয়ে যাবে। মালের কোন নমুনা এনেছ?

—হ্যাঁ।

—দেখাও।

পকেট থেকে মিঃ ভাটিয়া কয়েক খণ্ড সোনার বাট আর কয়েকটা হীরের টুকরো বের করলেন।

বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে সেই বোবা কালা বেয়ারাটি সব দেখল।

শেঠ শান্তিরাম জিনিসগুলো সব নেড়েচেড়ে দেখে বললেন—তা কত টাকার মাল তোমার ষ্টকে আছে এখন?

—তা লাখ পঞ্চাশেকের মত।

টাকার অঙ্ক শুনে বোবা বেয়ারাটি একটু ভড়কে গেল।

কিন্তু মিঃ ভাটিয়া তাচ্ছিল্যের সাথেই টাকার অঙ্কটা ঘোষণা করলেন, যেন এ অতি সামান্য টাকা, আর শেঠ শান্তিরামেরও তাতে ভ্রূ কোঁচকালো না।

বোবা কালা বেয়ারাটি বুঝতে পারল যে, পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা এদের কাছে কিছুই নয়।

ওদের ঘরের আলো নিভে গেল। কাল মাল পৌঁছে দেবেন বলে বেরিয়ে গেলেন মিঃ ভাটিয়া।

মিঃ ভাটিয়া বেরিয়ে যাবার আগেই পাইপ বেয়ে সোজা নীচে নেমে বেয়ারাটি সেই মোটরের ডালার নীচে আবার আত্মগোপন করে রইল।

মোটর আবার ছুটল গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের দিকে।

॥ নয় ॥

পরদিন সকাল।

থানায় বসে আলাপ করছে মিঃ শেঠ, দীপক ও রতন।

দীপকের হাতে একখানা ডায়েরী। সেখানার বিশেষ কয়েকটি জায়গা এদের পড়ে শোনাচ্ছিল। সব শুনে ইন্সপেক্টর মিঃ শেঠ বললেন—তাহলে তো আমরা অপরাধীকে এখনই গ্রেপ্তার করতে পারি?

—না। এখনও সে সময় আসেনি।

—কেন, অপরাধীর স্বীকৃতি তো এই ডায়েরীতেই আছে?

—তা আছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা অপরাধীকে একেবারে মালসমেত হাতেনাতে ধরা।

—কিন্তু তা কি করে হবে?

—হবে। আজই আপনি শেঠ শান্তিরামের বাড়ির চারদিকে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রাখুন, আর গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের দিকে নজর রাখুন। দেখবেন ওরা মালসমেত আজই ধরা পড়বে। ওরা যদি ভয় পেয়ে সব জানতে পেরে আগে থেকে সাবধান হয়ে যায়, তাহলে ওদের মাল ওদের ঘরেই থাকবে।

—কিন্তু তাতে লাভ?

—লাভ এই যে, ওদের অপহৃত জিনিসটা আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হব, এবং যাদের জিনিস তাদের ফিরিয়ে দিতে পারব। কিন্তু এখন যদি ওকে গ্রেপ্তার করতে যান, তবে মাল হয়তো ও সরিয়ে ফেলবে।

—বেশ, তাই হোক।

* * *

রাত দশটা।

মিঃ ভাটিয়ার ঘরের ফোন বেজে উঠে

—হ্যালো···মিঃ ভাটিয়া স্পীকিং।

—আমি শেঠ শান্তিরাম বলছি।

—বল, কি খবর ?

—আমার মাল তো এখনও এসে পৌছাল না।

—বল কি, সে তো আমি অনেক আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি।

—কিন্তু এখনও এসে পৌছায়নি।

— আচ্ছা, তুমি কিছু ভেবো না। আমি দেখছি।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল সামু।

—কি রে সামু, মাল জায়গামত পৌছে দিয়ে এসেছিস ?

—না।

—কেন ?

—শেঠজীর বাড়ির চারপাশে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। তাছাড়া···

—তাছাড়া কি ?

—পথে আমাদের লরি আটক করে পুলিশ সার্চ করছে।

—কোন রকম সন্দেহজনক কিছু পায়নি তো ?

—আজ্ঞে না স্যার।

—আচ্ছা, তুই যা। দরকার হলে তোকে ডাকব।

সামু বেরিয়ে যায়। ফোন তুলে নেন মিঃ ভাটিয়া। ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করেন।

তারের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে কণ্ঠস্বর।

—হ্যালো···শেঠ শান্তিরাম স্পীকিং।

—আমি মিঃ ভাটিয়া কথা বলছি।

—বল, কি খবর ?

—তুমি একটু সাবধানে থেকো।

—কেন ?

—তোমার বাড়ির চারপাশে পুলিশ ঘেরাও করেছে।

—বল কি !

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কেন ?

—তোমার ওখানে যে আমার লোক আজ মাল নিয়ে যাবে, এটা যেন কি করে পুলিশের কর্ণগোচর হয়েছে।

—বল কি ? তবে কি সেদিন রাতে আড়ি পেতে আমাদের কথা কেউ শুনেছিল ?

—আমার তো মনে হয় শুনেছিল। যদি না শুনে থাকবে, তবে তোমার বাড়ি কি করে পুলিশের পাহারাধীনে থাকে ?

—তাহলে মালটা কি পাব না ?

—পাবে।

—কি করে ?

—আমি নিজে গিয়ে আজকের মধ্যেই পৌঁছে দেব।

—আচ্ছা, তবে ছেড়ে দিচ্ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে মিঃ ভাটিয়া আবার অস্থিরভাবে কয়েকবার ঘরময় পায়চারি করে বেড়ালেন।

* * *

রাত বারোটা। কোলকাতার সবচেয়ে বড় জুয়েলার রাধেশ্যাম আততায়ীর হাতে ছুরিকাহত হলেন। তাঁর বাড়ি থেকে উধাও হলো প্রায় লক্ষাধিক টাকার সোনা।

সে বাড়িতে যখন নামল বিষাদের ছায়া, গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবে তখন বয়ে গেল আনন্দের বন্যা।

হাস্তে লাস্তে মেতে উঠল গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাব।

মদ্যপানের মাত্রাও বেড়ে গেল। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে জ্ঞান হারাল সকলে।

শুধু মিঃ ভাটিয়া আর সেই হাবা কালা বেয়ারাটি জ্ঞান হারাল না।

আজও ঘুমিয়ে পড়লেন মিঃ ভাটিয়া। ঘুমোবার আগে অনেকবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ি থেকে বের হতে। কিন্তু বাড়ির চারদিকে এমন কি পেছনের রাস্তাতেও পুলিশ মোতায়েন দেখে তিনি আর বেরোননি। ওদিকে শেঠ শান্তিরামও ফোন ক'রে জানিয়েছেন যে তাঁর বাড়ির চার-পাশের পুলিশ তখনও সরেনি।

তাই তাঁরা উভয়েই ঠিক করেছেন, চার পাঁচদিন তাঁরা কোনরকম কাজ না করে থাকবেন।

মিঃ ভাটিয়া যখন ফোনে এরূপ কথাবার্তা বলছিলেন শেঠ শান্তি-রামের সাথে, তখন আমাদের পরিচিত সেই হাবা কালা বেয়ারাটি তার ঘরের খাটের নীচে অপেক্ষা করছিল।

ফোন ছেড়ে দিয়ে মনের আনন্দে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন মিঃ ভাটিয়া। কিছুক্ষণ পরে শোনা গেল তাঁর নাক ডাকার শব্দ।

এদিকে কর্মতৎপর হয়ে উঠলো সেই বেয়ারাটি।

সে তার পকেট থেকে বের করল একটা কালির প্যাড। তারপর মিঃ ভাটিয়ার যে হাতটা তাঁর খাটের একপাশে ঝুলে পড়েছিল, সেটা তাঁর ডান হাত কি না দেখে নিয়ে প্যাডের কালি মাখাল তাঁর আঙুলে। তারপর পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে মিঃ ভাটিয়ার হাতে সেখানা চেপে ধরল।

মিঃ ভাটিয়ার ঘুম তত গাঢ় নয় যে, কেউ তাঁর হাতের ছাপ নিলে ঘুম ভেঙে যাবে না।

বিছানার সাথেই বেউ-সুইচ ছিল। সেটা টিপে দিয়েই রিভলবার বের করে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন মিঃ ভাটিয়া।

কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু আলোতে নিজের হাতের আঙুলের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এটা বেশ বুঝতে পারলেন, কেউ তাঁর হাতের ছাপ নিয়েছে।

কিন্তু কি করে তাঁর ঘরে এলো? দরজা বন্ধ করেই তো শুয়েছিলেন। দরজা বন্ধ করে আলো জেলে চুপচাপ বসে রইলেন মিঃ ভাটিয়া।

এদিকে সেই হাবা-কালা বেয়ারাটি তখনও খাটের তলায় আত্মগোপন করেছিল।

সে বুঝতে পারল আজ রাতে আর এ লোকটা ঘুমুবে না।

অতএব তাকে এখান থেকে বের হতে হলে, সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হতে হবে।

হঠাৎ কোমর থেকে একটা পিস্তল বের করে আলোটাকে লক্ষ্য করে সে ফায়ার করল।

আলো নিভে গেল।

পিস্তল নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে সিগারেট লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন মিঃ ভাটিয়া।

এবার মিঃ ভাটিয়ার হাত লক্ষ্য করে ফায়ার করতে তাঁর পিস্তল মাটিতে পড়ে গেল। তারপর কাঁচের শার্সি ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এল লোকটি।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ মিঃ ভাটিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর কিছুই করবার রইল না। তখনও তিনি ভাবতে লাগলেন কি দুঃসাহসিক এ লোকটি, যে তাঁর চোখের সামনে লুকিয়ে থেকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন মিঃ ভাটিয়া, কাল সকালেই তাঁর এখানকার কাজ মিটিয়ে দিয়ে প্লেনের টিকিট কাটবেন।

॥ দশ ॥

পরদিন সকাল।

বহ্নি দেবীর আহ্বানকে উপেক্ষা করতে না পেরে দীপক শত কাজের মাঝেও সেখানে গিয়ে হাজির হলো।

—এই যে, দীপক এসেছ? তোমাকে তো আজকাল দেখাই যায় না।

—বড় কাজে ব্যস্ত আছি দিদি।

—আমার সুবিমলের কথা কি তোমরা ভুলে গেলে ভাই?

—না দিদি, ভুলিনি।

—তবে তার হত্যাকারীকে এখনও তোমরা গ্রেপ্তার করতে পারছো না কেন?

—প্রমাণের অভাবে এতদিন তাকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি। আশা করি কয়েক দিনের মধ্যেই সুবিমলের হত্যাকারীকে আমরা গ্রেপ্তার করতে অক্ষম হব।

—তুমিও কি সেই দলে ঢুকেছো নাকি?

—হ্যাঁ, আমি ঐ গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবে বেয়ারার কাজ করি।

—বল কি!

—হ্যাঁ।

—তাহলে তুমি এতদিন সুবিমলের হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করার কাজেই লিপ্ত আছ—কি বল?

—হ্যাঁ দিদি।

—বেশ। আমি কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি বিজয়ী হও।

—আমি তাহলে আসি দিদি ?

—এসো। তবে শোন, আমি কাশী যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছি। যেদিন জানতে পারব সুবিমলের হত্যাকারী ধরা পড়েছে, সেই দিনই আমি তাকে একবার দেখে কাশী চলে যাব।

—আচ্ছা সে গ্রেপ্তার হলে আমি তাকে দেখিয়ে নিয়ে যাব।

* * *

বহ্নি দেবীর ওখান থেকে সোজা থানায় চলে এল দীপক।

—এই যে, দীপকবাবু, এসে গেছেন। বললেন মিঃ শেঠ।

—তারপর খবর কি ?

—খবর তো মশাই আপনার কাছে।

—আচ্ছা মিঃ শেঠ, জানকীপ্রসাদের পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট এসেছে ?

—হ্যাঁ।

—ওর বুকে বিদ্ধ ছুরির ফিঙ্গার প্রিণ্ট নেওয়া হয়েছে ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, এই কাগজখানায় একটা হাতের ছাপ আছে। এই ছাপের সাথে ঐ হাতের ছাপ মেলে কি না সেই রিপোর্টটা আমায় জানাবেন।

—আচ্ছা। আপনি কি এখন কোন জায়গায় যাবেন নাকি ?

—হ্যাঁ। আমাকে আরো কয়েকটা কাজ করতে হবে।

বাইরে বেরোতে গিয়ে ফিরে এসে দীপক বললে—ও হ্যাঁ, আজ থেকে আপনি পুলিশ দিয়ে শান্তিরামের বাড়ি ও গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের চারিদিক ঘিরে রাখুন। আমার মনে হয়, আজই আমরা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব।

দীপক তার প্রাইভেট কারটি নিয়ে সোজা চলল এয়ারপোর্টের দিকে।

নিজের আইডেন্টিফাই কার্ডখানা দেখিয়ে সোজা চলে গেল অফিস-ইনচার্জের কাছে।

অফিস-ইনচার্জ তাকে সাদরে আহ্বান করে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বললেন—তারপর, আমাদের এখানে আবার কি মনে করে?

—ভয় পেয়ে গেলেন নাকি?

—আপনাদের দেখে তো ভয় পাওয়া উচিত। কখন কার মধ্যে দিয়ে আপনারা যে কি বের করেন তার কোন ঠিক নেই।

—তা যা বলেছেন।

উভয়ের রসিকতায় উভয়েই হেসে উঠলেন।

তারপর শুরু হলো কাজের কথা।

—আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি।

—আরে, প্রয়োজন ছাড়া যে আপনারা আসেন না, তা কি আমি জানি না? বলুন, আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি?

—আচ্ছা, আজ কিংবা কাল কেউ কি ইউরোপ অর্থাৎ ধরুন পাশ্চাত্ত্য কোন দেশে যাবার জন্যে টিকিট বুক করেছেন?

—তা তো করেছেন।

—কে কে যাচ্ছেন, আমাকে তাঁদের নামের তালিকাগুলো একবার দেখাবেন? বিশেষ জরুরী দরকার আছে।

—তা আর দেখাব না কেন?

চার্টের উপরে নজর বুলিয়ে দেখতে পেল মিঃ ভাটিয়ার নামটা আগামী পরশুর প্যাসেঞ্জার তালিকায় সবচেয়ে উপরেই আছে।

দুটো চার্ট ফেরত দিয়ে তৃতীয় চার্টটা হাতে নিয়ে দীপক বললে—আচ্ছা, এই প্লেনটা কখন ছাড়বে?

—ন'টা ত্রিশ মিনিটে।

—বেশ। কিন্তু আমার অর্থাৎ আমাদের উপস্থিত হবার আগে যেন এ প্লেন ছাড়া না হয়।

এই কথা বলে দীপক চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

অফিস ইনচার্জ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন—কেন স্যার? কি হয়েছে? এতে কি আবার কোন অপরাধী পালাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তাই হবে।

দীপক সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যায় নিজের বাড়িতে। সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল রতন।

—এই যে, তুই এসে গেছিস্। আমি তোর জন্যে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।

—বস, আমি আসছি।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে দীপক বললে—জানিস রতন, আজ বোধহয় আমরা অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হব।

—তাই নাকি? তাহলে আজ দিনের বেলায় একটু মজা করে ঘুমুতে পারি?

—তা পারিস্।

—বেশ, তাহলে আমি চলি।

রতন বেরিয়ে পড়ল।

দীপক ঘরের দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

॥ এগারো ॥

পরদিন সকাল।

দীপক সোজা গেল থানায়।

শুনতে পেল মিঃ শেঠ অসুস্থ। তিনি ডিউটিতে আসবেন না আজ।

দীপক চিন্তিত হলো।

মিঃ শেঠ যদি অসুস্থ থাকেন, তাহলে তাঁর অভিযান কি করে সম্ভব হবে?

তখন সে চিন্তা করতে লাগল।

পুলিশ কমিশনারকে গিয়ে বললে নিশ্চয়ই তিনি একটা ব্যবস্থা করবেন।

দীপক তক্ষুনি গেল পুলিশ কমিশনার মিঃ গুপ্তের কাছে।

মিঃ গুপ্ত বললেন—কি ব্যাপার?

—বলছি। আজই একটা সার্চ ওয়ারেন্ট চাই।

—কেন?

দীপক সংক্ষেপে সব কথা খুলে বললে।

মিঃ গুপ্ত চিন্তিত হলেন। বললেন—ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মিঃ গুপ্ত পুলিশ বাহিনীকে রেডি হতে বললেন। পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হলো।

মিঃ গুপ্ত বললেন—এই দলের দলপতি কে?

—তা জানি না। তবে আশা করি তাকে ঠিকই ধরতে পারব

—আজই?

—আশা করছি।

মিঃ গুপ্ত খুশী হলেন। তিনি ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন পরবর্তী ঘটনার জন্যে।

রাত আটটা।

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের বাতি ঠিক তেমনিভাবেই জ্বলছে আর নিভছে।

ক্লাবঘরে প্রতিদিনের মতই সভ্যদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

সুষ্ঠুভাবেই চলেছে দৈনন্দিন কাজকর্ম।

তবে ক্লাবের ভূ-গর্ভের কক্ষে যে একটি জুয়ার আড্ডা বসে, সেটা আজ বসেনি।

মিঃ ভাটিয়াকে দেখা গেল না তাঁর সেই নির্দিষ্ট আসনে।

এরা সব গেল কোথায় ?

পাতালপুরীর খদ্দেররা আজ মনমরা হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

* * *

পাতালপুরীর সেই কক্ষ।

সেখানে একটা চেয়ারে বসে আছেন মিঃ ভাটিয়া। তাঁর পাশে মুখোসধারী একজন অচেনা লোক। তার প্রকৃত পরিচয় কেউ জানে না।

কিন্তু সবাই শুনেছে যে, সেই হলো প্রকৃতপক্ষে এর দলপতি।

তাদের ঘিরে বসেছিল দশ বারো জন লোক।

নানা জাতির লোক তারা। কেউ বাঙালী, কেউ গুজরাটি, কেউ বিহারী, কেউ পাঞ্জাবী।

মিঃ ভাটিয়া তাদের দিকে চেয়ে বললেন—ভাইসব, বিশেষ কারণে তোমাদের আজ ডাক দিয়েছি। যে কাজ এখনই আমাদের করতে হবে, তা বিশেষ জরুরী বলে জানবে।

—কি কাজ বলুন ?

—পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে আমাদের ওপরে। তারা আমাদের সব কিছু জেনে ফেলেছে। তাই আমাদের এখনই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

একজন বললে—স্যার, এ পাতালপুরীর খবর ত আর তারা জানে না।

—আমার তো মনে হয় জানে। দীপক চাটার্জী এমন লোক যে তার পক্ষে কিছুই জানা অসম্ভব নয়।

—তা বটে।

একজন বললে—তাহলে আমরা এখন কি করব তাই বলুন ?

—আমরা এখনই এখান থেকে পালাব। গুপ্তপথ দিয়ে পালাতে হবে। আমাদের এতদিনের সঞ্চয়, দীর্ঘদিনের কর্মের ফল সঞ্চিত অর্থ আমরা পুলিশের হাতে দেব না।

—নিশ্চয়ই না।

—এ পথেও পুলিশ দু'একজন আছে। তাদের ঘায়েল করা যাবে, আমরা নিরস্ত্র নই। দু'চারটে পুলিশ খতম করার শক্তি আমাদের আছে। তোমরা এখন সব সম্পদ এনে জমা করো এখানে।

সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হলো।

রাশি রাশি সোনার তাল আর নোটের বাণ্ডিল এনে জমা করা হলো।

সেগুলো বড় বড় বাক্সে পোরা হলো।

মিঃ ভাটিয়া বললেন—এবার চল গুপ্তপথে।

কিন্তু বাইরে বের হবার আগেই এলো বিরাট এক বাধা।

বজ্রগম্ভীর স্বর শোনা গেল—মাথার উপরে হাত তোল তোমরা! কেউ নড়বে না! যে যেখানে আছ চুপ করে দাঁড়াও! নড়বার চেষ্টা করলে গুলিতে প্রাণ দিতে হবে!

ওদের একজন বন্দুক তুলে গুলি করতে গেল। কিন্তু পারল না। তার আগেই দুটো শব্দ হলো—গুড়ুম! গুড়ুম।

তার শ্বাসহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল।

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের বাইরে মাইক মারফত ঘোষণা শোনা গেল: ক্লাবের মেম্বারগণ! আপনারা যে যেখানে আছেন চুপ করে বসুন। কেউ

পালাবার চেষ্টা করবেন না। যে যেমন আছেন, ঠিক তেমনি থাকুন, নড়লেই মৃত্যু।

সকলে চঞ্চল হলো।

মাইকে আবার শোনা গেল :

ভয় নেই। পুলিশ প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে অপর সকলকে ছেড়ে দেবে। আপনারা অনর্থক চঞ্চল হবেন না।

গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবটার চারদিকেই পুলিশ ছেয়ে গেল।

গুপ্ত রাস্তার সন্ধান কেউ জানত না বলেই ধারণা ছিল ওদের।

তাই তারা মনের আনন্দে মালপত্র নিয়ে বের হবে ভেবেছিল।

এমন সময় দেখা গেল পিস্তল হাতে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং পুলিশের ডি. সি., দীপক চ্যাটার্জী এবং চার-পাঁচজন আর্মড পুলিশ।

তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

দীপক এলো ভেতরে।

ধরা পড়ল মিঃ ভাটিয়া, সামু ও তাদের দলবল।

কিন্তু একজনকে ধরা গেল না।

সে হলো সেই মুখোশধারী।

সে হঠাৎ হেসে উঠল হা হা করে। বললে—দীপক, তুমি ব্যর্থ হলে।

বলেই, চেয়ারসুদ্ধ সে যেন হঠাৎ ভূগর্ভে নেমে গেল।

দীপক গুলি ছুঁড়ল।

কিন্তু তার গায়ে লাগল না। পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

* * *

সকলকে থানায় আনা হলো।

সেই ডায়েরী আর হাতের ছাপ যা ছুরির ছাপের সঙ্গে মিলেছিল, তা থেকে মিঃ ভাটিয়ার অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হলো না।

পুলিশ কমিশনার দীপককে বললেন—কিন্তু ঐ দলপতি কে ?

—আজ নয়।

—তবে ?

—পরে জানাব স্যার। তবে তাকে আপনারা সকলেই চেনেন।

—তিনি সামনে আসেন না ?

—না। সব সময় তিনি থাকেন অন্য বেশে। তিনি একান্ত পরিচিত লোক, কিন্তু গোপনে অবস্থান করেন।

—বুঝেছি।

বহ্নিদেবী তাঁর ভাইয়ের হত্যাকারীকে সাম্‌নে দেখে রাগে অন্ধ হলেন। তিনি তার গালে চড় মারলেন প্রচণ্ড বেগে।

দীপক বাধা দিল।

বললে—আইনমত ব্যবস্থা হবে দিদি। আর মিঃ ভাটিয়া আজ্ঞাবাহী মাত্র। প্রকৃত দলপতি ধরা পড়েনি।

—সে কোথায় ?

—জানি আমি। শীগ্‌গিরই ব্যবস্থা করব। মিঃ ভাটিয়া জানেন—তবে বলবেন না।

মিঃ ভাটিয়া রেগে বললেন—খুব দাঁওমত তুমি আমাদের ধরেছ। আধঘণ্টা আগে সরে পড়তে পারলে ধরা পড়তাম না।

—তা ঠিক। কিন্তু তা তো হলো না।

মিঃ ভাটিয়া রাগে গজ্‌ গজ্‌ করতে লাগলেন।

* * *

এদিকে পুলিশ কোর্টে মামলা উঠল।

দীপক জজকে বললে—স্যার, আর দুটো দিন সময় দিন। এরা বন্দী থাক।

—কেন ?

—প্রকৃত দলপতি এখনো ধরা পড়েনি।

—আচ্ছা, কবে ধরতে পারবেন আশা করেন ?

—দুদিন সময় চাই স্যার।

—ঠিক আছে।

ওরা বন্দী হয়েই রইল পুলিশ হেফাজতে।

॥ বারো ॥

পরদিন সকাল।

দীপককে খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল।

দীপক গেল জোড়াসাঁকো অঞ্চলের একটা আধভাঙা বাড়ির সামনে।

বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল দীপক।

একজন লোক এসে প্রশ্ন করল—কাকে চাই ?

—রশীদ আছে এখানে ?

—হ্যাঁ।

—তাকে একটু চাই—জরুরী কথা আছে।

একটু পরে রশীদ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে প্রায় দৌড়ে।

বললে—আরে, আপনি এত ভোরে ?

—কি করছিলে তুমি ?

—এই একটু খেলাধুলো করতে ব্যস্ত ছিলাম আমি।

—বুঝেছি। শোনো, বিশেষ জরুরী কাজে আমি এসেছি এখানে।

—বলুন।

—আমি জানি, তুমি আগে নিয়মিত গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবে যেতে। আমি দেখেছি।

—তা যেতাম।

—সে ক্লাব ত কাল রেড হয়েছে।

—তাও শুনেছি।

—কিন্তু মিঃ ভাটিয়া ধরা পড়লেও আসল কর্তাকে ধরা যায়নি। সে উধাও।

রশীদ হাসল। বললে—সে কথাটিও জানি।

—জান? তা তোমাকে মোটা পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করব, যদি একটা কাজ কর।

—কি কাজ?

ঐ কর্তাটিকে ধরতে চাই।

রশীদের দুটি চোখ লোভে চকচক করে উঠল। বললে—কত পাব?

—কত চাও?

—হাজার দুই।

—তাই পাবে। এই নাও পাঁচশো টাকা অগ্রিম।

—ঠিক আছে।

রশীদ তখন দীপকের কানে কানে কি সব কথা বললে।

দীপক বললে—ঠিক ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু খবর মিথ্যা হলে টাকাটা ফেরত দিতে হবে, মনে রেখো।

—নিশ্চয় দেবো।

দীপক বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

* * *

তক্ষুনি সে সোজা গেল লালবাজারে। পুলিশ কমিশনার ও ডি-সি'র সঙ্গে দেখা করল।

তাঁরা বললেন—কি ব্যাপার ?

—এক্ষুণি বেরোতে হবে।

—কেন ?

—বেলা দশটার মধ্যে দমদমে পৌছুতে হবে আমাদের।

—এখনই তাহলে রেডি হতে বলি ?

—ঠিক আছে।

তক্ষুনি পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল যাত্রা করার জন্যে।

দীপক বললে—একটা কথা স্যার—

ডি-সি বললেন—বলুন।

—আমি যেখানে যা করতে বলব তাই নিঃসন্দেহে করতে হবে।

—একথা কেন ?

—এর কারণ হলো, হয়ত এমন কোনও ঘটনার সম্মুখীন হতে পারেন যে, আপনি প্রকৃত অপরাধীকে ধরার মত বল হারিয়ে ফেলতেও পারেন। তা করলে কিন্তু চলবে না।

—ঠিক আছে।

দীপক প্রস্তুত হয়ে নিল।

তারপর বের হলো পুলিশ বাহিনী সোজা দমদম এরোড্রোমের দিকে।

* * *

পুলিশ বাহিনীকে এরোড্রোমে আসতে দেখে যাত্রীদের অনেকে অবাক হলো।

নানা শ্রেণীর যাত্রী—বিভিন্ন জাতের লোক।

পুলিশ বাহিনীর আট দশজন লোক নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

দীপক গেল সোজা এন্‌কোয়ারী অফিসে।

—কি চান ?

—একটা আর্জেণ্ট খবর জানতে চাই। আমি পুলিশ বিভাগের লোক।

—বলুন।

—আজ বেলা ঠিক দশটায় কোনও প্লেন ছাড়বে কি ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ প্লেন ?

—একটা রিজার্ভ করা প্লেন।

—কোথায় যাবে ?

—আপাততঃ দক্ষিণ কোরিয়া।

—কে যাবেন সে প্লেনে ?

—দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত। তিনি ভারত থেকে সেখানে চলেছেন জরুরী কাজে।

—বুঝেছি।

দীপক বেরিয়ে এলো।

তারপর ডি-সি'কে সব কথা বলে, বললে—ঐ প্লেনটা সার্চ করতে হ'ব এক্ষুনি।

* * *

দীপকের কথা শুনে ডি-সি ও পুলিশ কমিশনার দু'জনেই বিস্ময়ে হতবাক।

তাঁরা বললেন—এ অসম্ভব।

—কেন ?

—কারণ, এমব্যাসীর প্লেন সার্চ করার কোনও রাইট নেই।

—জানি।

—তবে ?

—ওটা ফরেন্ এমব্যাসীর প্লেন নয়।

—কেন ?

—ঐ লোকটাই জাল।

—জাল ?

—হ্যাঁ, ঐ হলো গ্রীণল্যাণ্ড ক্লাবের বড়কর্তা এবং দলপতি।

—সেকি !

—ঠিকই বলছি।

—কিন্তু যদি তা না হয় তাহলে কি হবে ? এত বড় রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হবে ?

—কিন্তু না নিলেও উপায় নেই।

—একথা বলছেন কেন ?

—উনি কোন রাষ্ট্রদূত নন।

—সেকি !

—হ্যাঁ।

—আপনি ঠিক জানেন ?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু এত বড় রিস্ক নেওয়া—

—আমি ত আগেই বলেছিলাম যে, যে কোনও দায়িত্ব নেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তবে এখানে আসা চলতে পারে।

—তা বটে।

দু'জনে ভাবলেন।

তারপর বললেন—আপনি শিওর ?

—নিশ্চিত না জেনে এত বড় ঝুঁকি নিতে কখনো রাজী হইনি।

—তা বটে।

তক্ষুনি প্লেনটাকে সার্চ করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হলেন।

* * *

দশটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

ঠিক দশটায় প্লেনটা ছাড়বে দমদম থেকে। যাবে দক্ষিণ কোরিয়ার দিকে।

প্লেনের মধ্যে যিনি বসে আছেন, তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত মিঃ হোং চু মুন।

মুখে তাঁর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি—ছোট ছোট গোঁফ। চোখে একটা কালো চশমা।

প্লেন ছাড়বার সময়ের ঠিক তিন মিনিট আগে হঠাৎ সশস্ত্র পুলিশ প্লেনটাকে ঘিরে ফেলল।

পিস্তল উদ্যত করে দীপক বললে—মিঃ মুন!

—কে আপনি?

—আমি যেই হই, আপনি নেমে আসুন।

—কেন?

—কোলকাতা পুলিশের অর্ডার।

—সে অর্ডার শুনতে আমি বাধ্য নই।

—কিন্তু আপনাকে নামতেই হবে—তা না হলে গুলি চলবে।

—এ অন্যায় জুলুম।

—বেশ, তার কৈফিয়ৎ আমরা দেব ভারত সরকারের কাছে। নেমে আসুন।

বাধ্য হয়ে মিঃ মুন নেমে এলেন।

—প্লেন সার্চ হবে।

—কেন?

—কারণ কিছু নিশ্চয় আছে।

—কিন্তু জানেন, আমি একজন রাষ্ট্রদূত?

—জানি। খুব ভালো করেই জানি।

—আমার প্লেন সার্চ করতে চান কোন্ অধিকারে?

—একটু পরেই তা জানতে পারবেন।

—ওয়ারেণ্ট আছে?

—ওয়ারেণ্ট শুধু নয়—স্বয়ং কমিশনার সাহেবও আছেন।

প্লেন সার্চ করা হলো।

দুটো বড় বড় বাক্স পাওয়া গেল।

সব বাক্সে বোঝাই শুধু সোনা আর হীরা জহরৎ।

দীপক বললে—মিঃ মুন!

—কি?

—এগুলো নিয়ে যাবার অধিকার কি আপনার আছে নাকি?

—না।

—তবে?

—তবুও আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম।

—কেন?

—কারণ, এগুলো আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

—না, এগুলো লুঠ করা সম্পত্তি।

—হোয়াট্! কি বলতে চান আপনি?

—বলতে চাই যে, আপনি একজন কুখ্যাত দস্যু। তাই আমরা আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে চাই।

মিঃ মুন এবার নীরব।

দীপক তখন একটা টানে তার দাড়ি-গোঁফ আর চশমা খুলে ফেলল।

সকলেই অবাক! বিস্ময়ে হতবাক!

ডি-সি বললেন—ইনি যে পুলিশ অফিসার মিঃ শর্মা দেখছি।

—ঠিক তাই।

দীপক হাসল।

বললে—ইনি পুলিশের কাজ করতেন বটে, তবে ওঁর প্রধান কাজ ছিল মিঃ ভাটিয়ার সহায়তা করা।

—সেকি কথা!

—হ্যাঁ। মিঃ ভাটিয়া অবশ্য এঁকে চিনতেন না—মানে, ইনি স্বরূপে দেখা দিতেন মাত্র—এই ছদ্মবেশটি তিনি জানতেন না।

—তাহলে ইনিই মিঃ ভাটিয়ার কর্তা?

—ঠিক তাই।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ শর্মাকে গ্রেপ্তার করা হলো।

এত বড় একটা দস্যুদলের উপরে এইভাবে যবনিকা নেমে এলো।

দীপক বললে—একবার ইনি পালাতে পারলে আর কোনও দিনই ধরা যেত না।

সকলে স্তম্ভিত।

মিঃ শর্মা বললেন—উঃ, আমি ভাবতে পারিনি যে আপনারা আমাকে ধরতে সক্ষম হবেন।

দীপক বললে—মিঃ শর্মা, আপনি খুব চতুর জানি। কিন্তু আপনি যত চতুরই হোন—দীপক চ্যাটার্জীর কাছে খুব ছেলেমানুষ, তা মনে রাখবেন।

—এতদিন আমি আপনাকে তাচ্ছিল্য করে দেখেছি, তাই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লাম।

—অনেক আগেই আমি আপনার স্বরূপ টের পেয়েছিলাম এবং লক্ষ্যও রেখেছিলাম আপনার গতিবিধি। কিন্তু তখন কিছুই বলিনি, কারণ আমি চেয়েছিলাম হাতেনাতে ধরতে।

—জানি আদালতের বিচারে আমার কঠোর শাস্তি হবে। তবুও আজ মুক্তকণ্ঠে আপনার গোয়েন্দাগিরির প্রশংসা করছি মিঃ চ্যাটার্জী।

গর্বে বুকখানা ফুলে উঠলো দীপকের।

* * *

বিচারে মিঃ শর্মা আর ভাটিয়ার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলো।
আর দলের অন্য সকলের হলো পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড।

—শেষ—

পরবর্তী আকর্ষণ

শ্রীস্বপনকুমার রচিত

সি-আই-ডি সিরিজের ৮নং বই

হীরার লকেটের রহস্য

আবার কোলকাতার বুকে দস্যু বীরভদ্রের আবির্ভাব।
লুণ্ঠন, হত্যা—সমগ্র মহানগরী ভীত-সন্ত্রস্ত! সুবিখ্যাত
ধনীর গৃহ হ'তে সযত্নরক্ষিত মোগল-সম্রাজ্ঞী
নূরজাহানের হীরার লকেট উধাও।
দস্যু দমনে দীপকের অভিযান।
প্রতি পাতায় শিহরণ—আতঙ্ক!

POLICE STATI

4

SAULESCU
PAUL